কামকল্পনা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

মহাগুরু দেবানন্দের শেষনিঃশ্বাসের অপেক্ষায় তাঁর শিষ্যকুল আমরা বসেছিলাম তাঁর শয়নকক্ষে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ঠাওরানোর উপায় নেই, তাঁর বক্ষদেশ এতই অচঞ্চল। আদুল দেহে চিত হয়ে শুয়ে আছেন যেন গঙ্গার স্থির ভাসমান। শরীরে কোথাও বেদনা থাকলেও মুখে তার ছোঁয়ামাত্র নেই। শুভ্র শ্মশ্রুগুফে আবৃত মুখটায় আভাস বলতে একটাই—ক্লান্তির। গত পূর্ণিমায় গুরু অধ্যাপনা সাঙ্গ করে হঠাৎই বলেছিলেন, ধাতুক্ষয়ের জন্যই যেমন পুরুষ ও নারীর রমণক্রিয়ায় বিরামের ইচ্ছা জাগে তেমনই আত্মবিশ্বাস ক্ষয়েই মানুষের জীবনে বিরামেচ্ছা উৎপন্ন হয়।

বলা বাহুল্য, গুরুর এই মন্তব্যে আমরা প্রমাদ গুনেছিলাম। অকস্মাৎ মহামতি বাব্যের শ্লোক প্রয়োগ করে জীবন ও রমণপ্রক্রিয়াকে এক করে দেখানোর ইচ্ছা হল কেন আচার্যের। চিরকালই তো তিনি কামশাস্ত্রকার শ্বেতকেতু, বাভ্রব্য বা গোনর্দীয়ের শ্লোক উদ্ধৃত করে এসেছেন পূর্বাচার্যদের সঙ্গে নিজের মতানৈক্য বোঝাতেই, বলেছেন পূর্বাচার্যেরা সুরতক্রিয়ার যান্ত্রিক তত্ত্বই উদ্ধার করতে পেরেছেন, তার দর্শনের জগৎ তাঁদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় বাৎস্যায়ন মুনিকে গুরু দেবানন্দ বলেছেন, কামশাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানী। কিন্তু দার্শনিক? না, ও সম্মানটুকু তিনি কৃপণের মতো গচ্ছিত রেখেছিলেন শুধু একজনের জন্যেই।

নিজের জন্য? না, তাও না। ভানুপ্রিয়ার জন্য।

এই ভানুপ্রিয়াটি কে, তা দীর্ঘ ত্রিশ বছর তাঁর সঙ্গ করে একটা ধারণা হয়েছিল আমার। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মানবীর চারিত্র্য ও প্রকার সম্পর্কেও আমার অনুমানে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কখনো মনে হয়েছে ভানুপ্রিয়া মহাবলীপুরমের কোনো রাজদুহিতা, কখনো বারাণসীর বিধবা, কখনো রেবতীর শাস্ত্রশীলা অন্তঃপুরিকা, কখনো উদয়নগরের বারবনিতা, কখনো গুরু দেবানন্দের মাতা, কখনো ভগিনী, কখনো বিচ্ছিন্না স্ত্রী কিংবা রক্ষিতা। আমার গুরুভাইয়ের নিজের নিজের মতো করে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা করে নিয়েছে ভানুপ্রিয়া সম্পর্কে। তবে যেহেতু শিষ্যকুলে গুরুর সঙ্গে আমারই সংসর্গ দীর্ঘতম তাই আমার ধারণাই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য পেয়েছে এতাবৎ।

অথচ গুরুকে মুখ ফুটে কেউ প্রশ্নও করিনি কোনওদিন : আচার্য, ভানুপ্রিয়া কে?

গুরুর বয়স অশীতিপ্রায়, অথচ জরা তাঁকে গ্রাস করেনি। উল্লিখিত পূর্ণিমায়ও তিনি পাঁচটি নবনির্মিত শ্লোক আবৃত্তি করলেন কামনার শোক বিষয়ে। বললেন, যে গভীর আনন্দবর্ধন হয় তারও নিষ্পত্তি শোকে।

আমি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন তুলেছিলাম, এ কী কথা, দেব? সুরতক্রিয়ার তীব্র আনন্দ কি নারী বা পুরুষকে তীব্র মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন রাখে না দীর্ঘসময়?

গুরু ম্লানভাবে হেসেছিলেন। তারপর বললেন, সেই মুগ্ধতাও তো স্মৃতিমাত্র। আর স্মৃতির জন্ম বিচ্ছিন্নতায়, সুখসমাপ্তিতে, শোকে। রমণস্মৃতি তাই আন্দোলনমাত্র এক ধরনের চিত্তবিক্ষেপ, পিপাসার জন্ম, যার অপর নাম শোক।

বেশ কিছুকাল যাবৎই শুরুর শিক্ষায় এই এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে : তিনি কামকলাকে অনিবার্য যন্ত্রণা হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। বলেছেন, শাস্ত্রকাররা বিধান দিলেও আমি কামকে ধর্ম ও অর্থের সঙ্গে ত্রিবর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। কারণ ধর্ম ও অর্থের দর্শন আছে, কামের দর্শন কোথায়? সুখ যে বর্গের অন্তিম লক্ষ্য তা দার্শনিকতাশূন্য। যে সুখ শান্তির স্তরে পৌঁছোয় না তার কোনো দর্শন হয় না।

এইসময় গুরুভাই গৌতম বললে, কিন্তু আচার্য, দেহের এই অপরিহার্য সুখ ব্যতীত কি জীবনে শান্তি আসতে পারে?

গুরু তাঁর সদ্যরচিত শ্লোকগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, নারী-পুরুষের জীবনে শান্তি আনে প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সমর্থন যা ধর্মের পথে আসে কাম তার সামান্য উপকরণ মাত্র। কামজনিত অনুরাগে প্রেমের উদগম হয়, তার বিশুদ্ধিকরণ হয় ধর্মে। তবেই শান্তি।

এরপর গৌতমের মতো বাকি সবাই নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। গুরু বলতে থাকলেন, মুনি বাৎস্যায়ন কামের সুস্থ সামাজিকতা দেখিয়ে গেছেন। আচারও। সংযত কামকে বলেছেন ধর্মাচার। কিন্তু সেই ধর্মাচারেও অধ্যাত্ম কোথায়? দার্শনিকের নিমগ্ন তপশ্চর্যা কোথায়? দার্শনিকের নিমগ্ন তপশ্চর্যা কোথায়? চতুর্দিকে দেখি স্থূল, পৃথুল কামকলাপ নিয়ে কবিরা কাব্যনির্মাণ করছে, এক কাল্পনিক কৃষ্ণ সৃষ্টি করে তাঁকে রতিসাগরে নিক্ষেপ করছে, বিস্মৃত হচ্ছে গীতার অবতারকে। কেবল ভানুপ্রিয়াই একটা সত্য উচ্চারণ করেছিল : কাম নিয়ে অজস্র গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় বলেই কবিদের তাই নিয়ে এত আদিখ্যেতা। মানুষ কুকুর বিড়ালের মতো সর্বসময়ে কামে লিপ্ত হলে কে আর তা নিয়ে কাব্য ফলাত? চক্ষুলজ্জা, সমাজবিধান এই সবই কামকে কবিতা করেছে।

বাৎস্যায়নের পর যে গুরু দেবানন্দকে আমরা জগদশ্রেষ্ঠ কামশাস্ত্রী জ্ঞান করে এসেছি এতদিন তাঁর এইসব মন্তব্যে আমরা উত্তরোত্তর বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। কামতত্ত্বের প্রতিই যেন এক তীব্র বিদ্বেষ প্রকট হচ্ছিল তাঁর কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা চালচলনে। একদিন যেমন দেখলাম গুরু তাঁর প্রিয় বাৎস্যায়নিক কামসূত্রের পুঁথিগুলো চেলাকাঠের আগুনে জ্বালিয়ে শেষ করেছেন। জিজ্ঞেস করতে বললেন, হর-পার্বতী কি কামসূত্র পড়ে রমণে লিপ্ত হতেন? কাম কি কবিতা যে তার একটা নির্দিষ্ট ভাব ও গঠন হবে? জনে জনে যা পৃথক তার আবার ব্যাকরণ কীসে?

আমি ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু মনের ও শরীরের আচরণের কি ব্যাকরণ হয় না? কবিতাও তো মনের আচরণ?

গুরু আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন যেন আমি নিতান্ত বালকের মতো কথা কইছি। তারপর ফের মন দিয়ে কামসূত্র পোড়াতে পোড়াতে বললেন,

কামকলার সেরা মাধুর্য কী জানো? তা হল ক্রিয়াটি সাময়িক উন্মাদনার ফলশ্রুতি। ব্যাকরণ শিক্ষা করে কবিতা রচনা যেমন অসম্ভব তেমনই অসম্ভব কামশাস্ত্রজ্ঞ হয়ে যথার্থ বেগবান নায়ক হয়ে ওঠা। কবিতার অনুপ্রেরণা আর সম্ভোগের নিয়ন্তাও এক উন্মাদনা, যার শাস্ত্র হয় না।

বললাম, তা হলে এতকাল ধরে যা শিখলাম...

গুরু বললেন, সবই সত্য, তবে অধস্তন সত্য। অর্থাৎ যা বিবরণমূলক। এবার শিক্ষা কর ঊর্ধ্বতন সত্য, যা...

উৎকন্ঠার বশে গুরুর কথার মধ্যেই বলে বসলাম, যা?

গুরু বললেন, যা স্বপ্নমূলক, অর্থাৎ অবাস্তব, অতএব দর্শনস্পষ্ট।

গুরুর ত্রিশ বছরের সান্নিধ্যে এমন হতভম্ব আমি হইনি কখনো। কামকলা অসম্ভব?

বললাম, মানুষের নিত্যকার ব্যবহারকে অসম্ভব বলছেন, দেব?

গুরু হাসলেন, বলব না? লিখলেটা কে? বাৎস্যায়নদেবই তো? যিনি জীবনে একবারটি সংগমে লিপ্ত হলেন না। অরণ্যের উপান্তে বসে ধ্যানবলে তিনি অরণ্যের অন্ধকারকে অনুমান করলেন।

বললাম, তাতে কি কামসূত্র বাস্তবতা হারায়?

গুরু বললেন, তা হারায় না, কিন্তু অমন বৃত্তান্ত থেকে কামকলার স্বপ্নিল অবাস্তবতায় পৌঁছোনো যায় না। সংগমের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলেই রমণের অসম্ভবতা আবিষ্কার সম্ভব। বাৎস্যায়ন যা চেষ্টাও করেননি আর...

-আর?

—আর আমি ভানুপ্রিয়ার দীর্ঘ সঙ্গলাভে বুঝলাম যে সব মানুষই এক অর্থে কামারণ্যের উপান্তবাসী, সে অরণ্যের বাইরে থেকেই অনুমানে, অনুমানে তার ধারণা গড়ে নেয়। অরণ্যে প্রবেশ করলেও তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সে বিশেষ কিছু স্মৃতি বহন করে আনে না। কিছু স্বাদ, বর্ণ, ঘ্রাণের স্মৃতির অতিরিক্ত সে সঞ্চয়ে রাখতে পারে না। কালে কালে তা-ও অন্য স্মৃতির মধ্যে মিশে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এবং একসময় হয়ে যায় সম্পূর্ণ কল্পনা। হয়তো এই কারণেই ভানুপ্রিয়া কামকলাকে বলত কামকল্পনা।

আমি বলে উঠলাম, তা হলে কি এইজন্যই আপনার কামসূত্রাবলির আপনি নামকরণ করেছিলেন কামকল্পনা?

গুরু হেসে বললেন, হয়তো। হয়তো না!

সেইদিন থেকেই একটু একটু করে আমরা শিষ্যরা গুরুর কামকল্পনার পুঁথি চুরি করা শুরু করি। সবারই একটাই ভয়—গুরুর যা মতিগতি দাঁড়াচ্ছে তাতে অচিরে এসব পুঁথিও হয়তো চেলাকাঠের আগুনে যাবে! গুরুর সম্পদ আহরণ ধীরাজ মুনির মতে নির্বাসনযোগ্য অপরাধ জেনেও আমরা এর কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে পারিনি। আমরা ধীরাজের অভিমতের বিরুদ্ধে মনে মনে প্রয়োগ করেছি কাশীর বিশ্রুত পন্ডিত ত্রিলোকনাথের যুক্তি : শিষ্যরাই গুরুর বৈধ উত্তরাধিকারী। আর আমরা তো স্বীয় স্বার্থে নয়, গুরুর ঐতিহ্য রক্ষার্থেই এ পথ ধরেছি। গুরুর সব রচনা আগুনে গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াব?

আমাদের মধ্যে একমাত্র যে নারীআশ্রমিক সেই নীলকান্তাই এ ব্যাপারে পথ দেখাল। গুরুর নিদ্রাযাপনের পূর্বে তাঁর শির ও পদযুগল মর্দনের সময়ে সে একটু একটু করে সরিয়ে আনতে শুরু করল কামকল্পনা পুঁথির ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, অধিকরণ ও টীকা। আমরা কি ভুলতে পারি সেইসব সুখ ও আহ্লাদের দিন যখন জনগণের সুবিধার্থে গুরুদেব স্বীয় সূত্রের টীকা রচনায় ব্যাপৃত হলেন।

কিন্তু গুরুর ওই পুঁথি অপহরণের মধ্যেই যেন যত বিপত্তির উৎপত্তি। একবার মহামূল্যবান পুঁথি হস্তগত হলে কে আর তা পড়ার লোভ সংবরণ করতে পারে! আমরাও পারিনি। আর সেইসব পুঁথি থেকেই আশ্চর্য আশ্চর্য সব তত্ত্ব উদ্ধার হতে থাকল। যেমন রমণ প্রসঙ্গে গুরু এক বিস্তীর্ণ আলোচনায় বলেছেন যে, রমণের এক প্রধান উল্লাস আবিষ্কারে। যে কারণে সমস্ত পুরুষের মধ্যে নব নব নারীদেহ আবিষ্কারের তাড়না থাকে। যা থেকে জন্মে ক্রম-অতৃপ্তি, যা কারণ হয় চরিত্রনাশের। তবে কী নারী, কী পুরুষে রতি ও রমণে প্রকৃত আবিষ্কার হল রতির সমার্থক চিন্তাদি যেমন রস, প্রীতি, ভাব, রাগ, বেগ ও সমাপ্তির পূঢ়ার্থ তথা রমণক্রিয়ার সমার্থক চিন্তাদি যেমন সম্প্রয়োগে, রত, রহঃ শয়ন ও মোহনের মর্মোদ্ধার। এই কথা ঋষি বাৎস্যায়নের কীর্তিতে আছে, কিন্তু বাৎস্যায়ন আবিষ্কার-মাহাত্মকে গুরুত্ব দেননি। ফলে অভ্যাসবশত রতি ও রমণ ঔদাস্যকেও প্রশ্রয় দেননি। গুরু দেবানন্দ এই সুখী, সফল কামসূত্রকে বলেছেন যান্ত্রিক, যার রাসায়নিক, জৈবতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিটোল, কিন্তু তাতে রহস্য নেই, দুর্লঙ্ঘ্য প্রশ্ন নেই, চিন্তার ঝাঁপ নেই।

অন্য এক জায়গায় দেখা গেল গুরু লিখছেন, ভানুপ্রিয়ার স্বরূপ উদ্ধারই আমাকে সাংখ্যদর্শন থেকে সরিয়ে আনল কামজিজ্ঞাসায়। কেমন হতে পারে চতুর্দশবর্ষীয় বালকের মন যখন...এর পরের রচনাংশ হাতে আসেনি বলে

জানা গেল না গুরু কোন বিস্ময় বা আবিষ্কারের কথা বলতে উদ্যত হয়েছিলেন। যেমন আরেকটি প্রসঙ্গেরও নিস্পত্তি হল না। পুঁথির পৃষ্ঠা এলোমেলো রয়ে গেল বলে, যেখানে গুরু বলেছেন, আমার ব্যক্তিগত আবিষ্কারের এক গূঢ় ক্ষেত্র হল রতি, রমণ ও স্বপ্নের সম্পর্ক। স্বপ্নের দ্বারাই আমরা রতিজীবনের জন্য তৈরি হই এবং আমাদের বাস্তব স্বপ্ন ও রতির সম্পর্ক অশ্রু ও মনোবেদনার মতো, হর্ষ ও হাস্যের মতো, কখনো কখনো যেমন হর্ষেও অশ্রুপাত হয়, বেদনার সঞ্চার হয় হাস্যের মতো, তেমনই সময় সময় স্বপ্ন ও রতিতেও এহেন বিহ্বলকর ব্যঞ্জনার উদ্ভাস হয়। ভানুপ্রিয়ার যৌনতা আবিষ্কারের দিন...হা হতোস্মি! ঠিক এইখান থেকেই পুঁথি নিশ্চিহ্ন। আমরা নীলকান্তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম পুঁথির এইসব অংশ সংগ্রহ করার জন্য। সে বললে, গুরুর শয়নকক্ষের অন্ধকারে আমি কী করে পড়ে পড়ে বার করব ও সব? হাতের কাছে যা পাই তাই উদ্ধার করে আনি।

সম্প্রতি যে-পুঁথিগুলো উদ্ধার করেছে নীলকান্তা তাতে কামকলা, যৌনতার ঊর্ধ্বে আরেক বিষয়ের কথা বার বার ফিরে এসেছে—মৃত্যু! তবে সেই মৃত্যুর আবহ হিসেবেও স্থানে স্থানে দেখা দিয়েছে যৌনতা। যেমন গুরু লিখছেন এক পর্যায়ে—ওঁ ধ্বনি ও মন্ত্রোচ্চারণের মতো পুরুষের শ্রবণেন্দ্রিয়কে যা অপূর্ব ধারায় আন্দোলিত করে তা হল স্ত্রীর শীৎকারধ্বনি। মৃত্যুপথযাত্রী পুরুষের ক্লান্ত চেতনায় মন্ত্রের মতো এই ধ্বনির স্মৃতি প্রত্যাগত হলে তা সুখের হয়। এও হল কামকলার অসম্ভবতার এক বিচিত্র, মধুর রূপ। মুনি বাৎস্যায়নের এই অভিজ্ঞতা হয়নি কারণ তিনি ছিলেন সংগমে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমার?

বিগত পূর্ণিমার পর গুরু দেবানন্দ অন্তিমশয্যা গ্রহণ করেছেন, সেই থেকে তাঁর বিশাল পুঁথিভান্ডার ঘাঁটাঘাঁটি করেও আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে কোনো নিষ্ঠ ধারণায় পৌঁছোতে পারিনি। তিনি কি কখনো বিবাহ করেছিলেন? কখনো কি নারীসঙ্গ ঘটেনি কামশাস্ত্রের এই অলৌকিক প্রতিভার? ভানুপ্রিয়া

কে? সে কি জীবিত না মৃতা না নিতান্তই কাল্পনিক? তাঁর মৃত্যুকালে গুরুর শেষ অভিলাষ কী?

নীলকান্তা সেদিন বলল, মূর্ধান্বিত অবস্থায় গুরু নাকি বার বার নাম ধরে ডেকেছেন ভানুপ্রিয়াকে।

গতরাত্রে নীলকান্তা যখন গুরুর কপালে জলসিঞ্চন করতে করতে মুমূর্ষ আচার্যকে জিজ্ঞেস করল, দেব, কিছু বাসনা করেন? গুরু নাকি অতিকষ্টে বিড় বিড় করে বলতে পেরেছিলেন, ধ্বনি ধরো।

ধ্বনি ধরার অর্থ দেবনামকীর্তন। যা সেই থেকে তাঁর শিষ্য আমরা সমানে করে চলেছি। কিন্তু, আশ্চর্যের আশ্চর্য, আশ্রমের একমাত্র নারী যুবতী নীলকান্তই জানাল গুরু নামধ্বনির সঙ্গে হয়তো শীৎকারধ্বনির কথাও বলতে চেয়েছেন। ফলে গুরুকক্ষের সংলগ্ন কুঠুরি যেখানে নীলকান্তার বাস সেখানে আমরা আশ্রমিকরা একের পর এক রমণে লিপ্ত হতে চললাম নীলকান্তার সঙ্গে! জ্যেষ্ঠ শিষ্য হিসেবে সদ্য তরুণীর সতীচ্ছদ ছিন্ন করার দায় বর্তায় আমার উপর। সেই অপূর্ব সম্ভোগের স্বাদ এখনও আমার ওষ্ঠে, জিহ্বায়, চক্ষে বস্তুত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছেয়ে আছে। আশ্রমিকদের মধ্যে আমি এবং নীলকান্তাই অবিবাহিত, ফলে কামশাস্ত্রাধ্যয়নের এক অলৌকিক প্রয়োগ আমাদের দু-জনার জীবনেই। পরে শুনেছি। নীলকান্তার শীৎকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল কীর্তনধ্বনি এবং সে-সময় এক অপূর্ব প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল গুরুর মুখমন্ডলে। রমণকালেই নীলকান্তা জানায় যে, এই অভিজ্ঞতার পর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে তার সঙ্গ করা অসম্ভব। সে কার্যত আমার স্ত্রী। ফলে সেই থেকে গুরুর ম্লান শ্রবণে শীৎকারধ্বনি প্রক্ষেপণের জন্য আমি ও নীলকান্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে রমণে লিপ্ত আছি। এবং এই অনির্বচনীয় সুখের মাধ্যমে উপলব্ধি করছি রতি ও রমণ তত্ত্বোত্তীর্ণ। কী বাভ্রব্য, কী শ্বেতকেতু,

কী গোনদ্দয়, কী দত্তক, কী ঘোটকমুখ, কী স্বয়ং বাৎস্যায়নদেব! গুরু দেবানন্দের কামদর্শনও কি...নবম বারের মতো আমার ধাতুক্ষয় হতে চলেছে...আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

আমার নিদ্রাভঙ্গ হল নীলকান্তার চুম্বনে। নীলকান্তা আমার বক্ষের উপর দেবী দুর্গার মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃতভাবে শায়িত। বলা যায় স্থাপিতও। আমি ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু সে চিরবেগা। আমি হেসে বললাম, কিছু বলবে? সে বলল, নাথ, জাগো। গুরুর সেই ভানুপ্রিয়া এসেছেন। দেখবে না?

ভানুপ্রিয়া! মুহূর্তের মধ্যে সব ক্লান্তি মিলিয়ে গেল দেহ ও মন থেকে, আমি দিগবসনা নীলকান্তাকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, কান্তা, বস্ত্র দাও।

আমরা শিষ্যরা গুরুর শয্যা ঘিরে বসেছিলাম, যখন এক অপূর্ব সৌরভ বিস্তার করে ঘরে প্রবেশ করলেন ভানুপ্রিয়া। আশ্রমে পা রাখার পর দীর্ঘ এক দন্ড তিনি এক বিশেষ কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। বলেছিলেন, গোধূলিলগ্নে আমি দেবদর্শন করব না। আচার্যের অনিষ্ট হবে।

কিন্তু সারা আশ্রম জেনে গিয়েছিল আগন্তুকের পরিচয়। দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে যে মহিলার ছবি ও ধারণা আমরা মনের মধ্যে গড়ে তুলেছি, আজ তিনি সাক্ষাৎ ধরা দিয়েছেন, রক্ত-মাংসে ধ্বনিতে সম্পূর্ণ। আশ্রমিক আমরা গুরু প্রিয় পার্বত্য লোকসংগীতে ভরিয়ে রেখেছিলাম গুরুকক্ষ, যখন শ্বেতবস্ত্র ও রক্তাভ ললাটিকায় অনিন্দ্য ব্যক্তিত্বময়ী ভানুপ্রিয়া প্রবেশ করলেন সেখানে আমরা সকলে একে একে উঠে নমস্কার জানালাম তাঁকে; তিনি কিছুটা উদাসীনভাবেই প্রতিনমস্কার করে গুরুর পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। গুরুর পদধূলি নিয়ে কয়েকবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করলেন তাঁর শয্যা, তারপর তাঁর

মাথার পাশে মাটিতে বসে চাপাস্বরে ডাকলেন, আনন্দ! আনন্দ! আমি এসেছি। আমি...আমি ভানুপ্রিয়া।

আমরা, আশ্রমিকরা, রোমাঞ্চে স্তব্ধ হয়েছিলাম। আমাদের গুরুদেবকে কেউ আনন্দ বলে ডাকছে, এ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আরও অবাক হওয়ার ছিল—বর্ষীয়সীর ডাকে এই প্রথম চোখ মেলতে দেখলাম, আমরা মুমূর্ষ আচার্যকে, আর তাঁর চোখে জল! তিনি চোখের এককোণ থেকে মহিলার দিকে চেয়ে বললেন, তুই শেষ অবধি আসতে পারলি, ভানু?

ভানুপ্রিয়া তাঁর সারা পিঠে ছড়ানো সাদা মেঘের মতো চুলের একমুঠি দিয়ে আচার্যের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, কেন, ভুলে গেলি আমার যে কথা ছিল সতী হওয়ার!

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন গুরু, অমন কথা বলিসনি, ভানু। ও আমি সইতে পারব না। ভগবান তোর প্রতি কঠোর হয়েছেন বলে আমি তো হতে পারি না।

ভানুপ্রিয়া এবার আঁচলে নিজের অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, আমি তো জীবনে কিছুই পাইনি, আনন্দ। এই শেষ গরিমাটুকু থেকেও আমায় বঞ্চিত করবি? গুরুদেব ফের দীর্ঘ সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ভানুপ্রিয়া আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আমাদের একটু নির্জনতার প্রয়োজন আছে বৎসগণ। একটু সময় দেবে?

আমরা গুরুদেব ও ভানুপ্রিয়াকে প্রণাম জানিয়ে কক্ষের বাইরে চলে এলাম; আসতে আসতে আড়চোখে দেখলাম গুরুর ওষ্ঠে চুম্বন রাখছেন ভানুপ্রিয়া। অকস্মাৎ অনুভব করলাম নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠার মতো এক নতুন জীবন—হোক

তা ক্ষণিকের—ভর করেছে গুরুদেবকে। নীলকান্তাকে বললাম, এ কাজ গহিত হলেও এ তোমাকে সম্পন্ন করতেই হবে কান্তা। পাশের কুঠুরিতে বসে তোমায় লিপিবদ্ধ করতে হবে গুরুদেব-ভানুপ্রিয়ার শেষ সংলাপ। ঈশ্বর জানেন কী বিশাল রহস্য অনাবৃত হবে সেই সূত্রে।

নীলকান্তা তার ছোট্ট কুঠুরিতে লেখনী ধরে সংলাপের অপেক্ষায় প্রথম যে ধ্বনি শুনতে পেয়েছিল তা ছিল, আমরা পরে জেনেছি, গুরুদেব ও ভানুপ্রিয়ার মিলিত কান্নার স্বর।

২.

আমরা রহস্যের আকাঙ্ক্ষাতেই নীলকান্তাকে গুরুকক্ষের সংলগ্ন কুঠুরিতে স্থাপন করেছিলাম। কিন্তু অধিক রাত্রে গুরুদেব যখন পুনরায় নীরব, নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লেন, ভানুপ্রিয়া আশ্রমের অতিথিনিবাসে ফিরে গেলেন এবং আমরা নীলকান্তার লেখা সংলাপ গোগ্রাসে পাঠ শুরু করলাম, অমাবস্যার অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় আমাদের হৃৎপিন্ড ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল গলা বেয়ে। আমরা রহস্যের প্রত্যাশায় ছিলাম; অকল্পনীয় আশ্চর্যবোধের আশঙ্কায় নয়। সংলাপের শেষ বাক্যটি পাঠ করার পর আমাদের কারওরই গন্ডদেশ শুষ্ক রইল না। কী মর্মব্যথায় গুরুদেব কামকলাকে অসম্ভব এবং পরাবাস্তব বলেছেন তার ইঙ্গিত পেলাম। সংলাপের একখানে ভানুপ্রিয়াও বলেছেন যে, সমস্ত শোক, দুঃখ, আনন্দ বিরহ, সাফল্য, গরিমা ও সাধনার মতো কামেরও নিষ্পত্তি মৃত্যুতে। বাৎস্যায়ন ও তাঁর কতিপয় পূর্বাচার্যও সম্ভবত অনুমান করেছিলেন যে, দেহমধ্যে লিঙ্গ ও যোনিই সবচেয়ে দেরিতে বৃদ্ধ হলেও, কাম ও কামনার মৃত্যু মৃত্যুতে। ভানুপ্রিয়া বলেছেন, প্রকৃত সতীদাহ স্বামী-স্ত্রীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আগুনে সঁপে দেওয়া। যাতে একের নাসিকা, ওষ্ঠ, চক্ষু, বক্ষ, হৃদয়, পাকস্থলী, অন্ত্রনালি,

জঙ্ঘা, পদ ও যৌনাঙ্গ অপরের অঙ্গের সঙ্গে নিশ্চিহ্নভাবে মিশে যায়। যা তাদের অন্তিম সংগম। কিন্তু হায়!...এইখানে ফের কান্নায় ভেঙে পড়ে কপালে করাঘাত করেছেন ভানুপ্রিয়া, আমার তো সেভাবেও সংকার হওয়া বিধেয় নয়, আনন্দ! আমি যে শিখন্ডী?

হ্যাঁ, দেবানন্দ-ভানুপ্রিয়া সংলাপের এই সেই মর্মান্তিক আবিষ্কার—ভানুপ্রিয়া শিখন্ডী। নপুংসক। উভলিঙ্গ। না পুরুষ, না নারী।

আমরা আরও আবিষ্কার করলাম গুরুদেব দেবানন্দ ভানুপ্রিয়ার পিতা আচার্য বহ্নিদেবের শিষ্য, যে বহ্নিদেব তাঁর গীতিভাষ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন যখন বার্তা পৌঁছোয় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য দেবানন্দ সাংখ্যচর্চা পরিত্যাগ করে কামশাস্ত্র রচনায় লিপ্ত হয়েছে।

আচার্য কিন্তু মৃত্যুকাল অবধি জেনে যেতে পারেননি দেবানন্দ কেন দর্শনচর্চা পরিত্যাগ করল। তিনি এও জানেন না সহসা এক প্রাতে দেবানন্দ কেন কন্যা ভানুপ্রিয়ার সঙ্গে আশ্রম থেকে পলায়ন করল। তিনি আক্ষেপে বলেছিলেন, কন্যা ভানুপ্রিয়া যোনিবিযুক্তা। সে কী করে সমাজধর্ম পালন করবে দেবানন্দের সঙ্গে?

দেবানন্দও জানে না তার প্রেয়সীর স্বরূপ, শুধু যৌবনধর্মে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়েছে ভানুপ্রিয়ার প্রতি। প্রথমে স্পর্শ, পরে ক্রম আলিঙ্গন—সৃষ্টক, বিদ্ধক, উদঘৃষ্টক, পীড়িতক, অবশেষে চুম্বন ও শেষের সেই ভয়ংকর দিনে—দেবানন্দ উন্মাদের মতো প্রার্থনা করেছে, ভানু এই পূর্ণিমার রাতে উদার হও, ভানু। আমি আর সইতে পারছি না। ভানুপ্রিয়া আপ্রাণ চেষ্টায় তার বসন আগলে রেখে বলেছে, ও তুমি চেয়ো না, আনন্দ। আমার দেবার কিছুই নেই। আমি অপ্রাকৃত, আমি অসম্ভবা।

এর পরদিনই ভানুপ্রিয়া সবার অলক্ষ্যে আশ্রম ত্যাগ করে। কাকপক্ষীও টের পায়নি তরুণী কোথায় গেল; শুধু দূর থেকে নীরব ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে নিষাদরি অরণ্যের প্রান্ত অবধি পৌঁছে গেল দেবানন্দ। অরণ্যের মুখে যুবতীর আঁচল আঁকড়ে ধরল যুবক, বলল—এ অরণ্যে কাঠ কুড়োতেও মানুষ আসে না। তুমি এখানে কী করবে?

ভানুপ্রিয়া বলল, আমি তো মানুষ নই। আমি লিঙ্গের, তাই না-মানুষ।

দেবানন্দ বলল, পশুকুল শিখন্ডী চেনে না, তারা রক্ত-মাংস চেনে।

ভানুপ্রিয়া বলল, মানুষও রক্ত-মাংসই চেনে, কামনা-বাসনা-রতি-রমণ জানে, মানুষ চেনে কি?

দেবানন্দ বলল, আমি তো সেই মানুষের অনুসরণেই এতদূর এলাম।

—কিন্তু সে-আসা পূর্ণ হওয়ার নয়। আমি রতিতে অপরাগ।

-তা হলে কামকলাও অসম্ভব। নারী-পুরুষের ধাতুক্ষয়ে যে কলার নিষ্পত্তি তা পূর্ণ মানবিক নয়। আর যা অমানবিক তা...

এখানে সাময়িক নিদ্রাভাব আসে অনুলেখিকা নীলকান্তার। সে পুনরায় সজাগ হতে শোনে গুরু দেবানন্দ বলছেন, ভানুপ্রিয়া, তোমাকে অরণ্যের উপান্তে শিখন্ডীদের মধ্যে রেখে আর গুরুগৃহে প্রবেশ করতে পারিনি। ভেবেছি তলিয়ে দেখব মুনি বাৎস্যায়নের সূত্রাদি, তারপর রচনা করব আমার বিরুদ্ধ-কামসূত্র।

তখনই ভানুপ্রিয়া হেসে বলে, তোমার কামকল্পনা?

দেবানন্দ বলে, কামের অসম্ভব।

দেবানন্দ-ভানুপ্রিয়া সংলাপে এও উদ্ধার হয় যে, প্রেয়সী অরণ্যবাসী হওয়ার পরও সাত-সাতটা বছর গুরুদেব তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করেন। প্রবল তর্ক ও বিতর্কে একটু একটু করে সত্যের আভাস পান। দিনমানে কবিরাজের হিসাবরক্ষার কাজ করে রাতে প্রদীপের আলোয় রচনা করেন তাঁর কামকল্পনার ভিত্তিসূত্র। ভানুপ্রিয়া প্রায়শই গুরুকে বলেছেন, আনন্দ, নারীসংগম করো, নচেৎ তোমার ধারণা আংশিক হবে। দেবানন্দ তখন বলেছেন, বাৎস্যায়নদেবেরও তো শুনেছি নারীসম্ভোগ ঘটেনি। আর তিনি লিখেছেন কামের নিয়মনীতি। কামকলার অসম্ভবতা রচনার জন্য নারীর কী প্রয়োজন?

তাঁদের শেষ সাক্ষাতে ভানুপ্রিয়া দেবানন্দকে প্রণাম করে বরমাল্য পরিয়ে দেন। বলেন, হৃদয় দিলাম, নাথ। দেহ দেব সতীদাহে।

তারপর একটু রয়ে সয়ে বলেছেন, ঢের হয়েছে নাথ-নাথ করা, তুমি শুধু আমার আনন্দ হয়েই থেকো। এই অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র আনন্দ।

গুরু তখন প্রতিবাদ করেছেন, তোমায় সুখ দিতে পারিনি, তোমার সতীত্ব দাবি করব কেন?

ভানুপ্রিয়ার প্রত্যুত্তর ছিল, কারণ সতীত্বই কাম জয় করে। অগ্নিসম পরাক্রমশালী কামকে এই এক অনুভূতিই পদানত করে। সতীত্ব কামের অসম্ভব। সতীদাহে সেই অলৌকিক সংগম।

দেবানন্দ উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, আমি সতীদাহ মানি না।

ভানুপ্রিয়া উত্তর করেছেন, আমিও মানি না। কিন্তু ভালোবাসা মানি।

কিন্তু ভালোবাসা মানে তো সহমরণে যাওয়া নয়।

—কিন্তু যে সহজীবন পেলে না?

এই সময় তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়েন দেবানন্দ। বলেন, কিন্তু কে তোমাকে জানাবে আমার মৃত্যুসংবাদ?

ভানুপ্রিয়া বলেন, আমার দেহ।

–তোমার দেহ! সে কী কথা?

–জানো না বার্ধক্যে স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনের মতো। তাদের সংলাপও তখন ব্রীজাত 'তুমি-তুমি' থেকে প্রায় 'তুই-তোকারি' হয়ে আসে। একের মনোব্যথা, দেহবেদনার সাড়া পায় অন্যে। তাই একজন গত হলে অন্যজনও শীঘ্রই মৃত্যুর মুখ দেখে।

দেবানন্দ বলেছেন, তার মানে তুমি সংবেদ পাবে আমার মৃত্যুর?

ভানুপ্রিয়া বলেছেন, যদি তোমার যাওয়ার পরিস্থিতি হয় পূর্বে। নচেৎ তুমিও সাড়া পাবে আমার মৃত্যুর।

সংলাপের শেষদিকে গুরু দেবানন্দ জানতে চেয়েছেন, তুই কী করে বুঝলি, ভানু, আমি যাচ্ছি?

ভানুপ্রিয়া জানিয়েছেন, সহসা জীবনে বিরামেচ্ছা অনুভব করলাম, আনন্দ।

জীবনে সব কিছুর উপর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাতে মনে হল তুই আমাকে ডাকছিস। প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হল, মনে হল বুক ফেটে যাবে। আমি শ্বেতশুভ্র বস্ত্রে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে তোর সন্ধানে বেরুলাম।

উদগ্রীব স্বরে তখন গুরুদেব জানতে চেয়েছেন, কিন্তু আমার ঠিকানা পেলি কীভাবে?

গভীর দুঃখের মধ্যেও আনন্দের হাসি হেসে বলেছেন ভানুপ্রিয়া, যেদিকে চোখ যায় হেঁটেছি। যখনই বুকে ব্যথা উঠেছে বুঝেছি পথ ভুল হল। ফের সঠিক পথে ফিরতেই ব্যথা মিলিয়ে গেছে। মনে হয়েছে তোর হৃৎপিন্ড আমার হৃৎপিন্ডকে আকর্ষণ করছে। শেষ অবধি পৌঁছোতে পেরে সব ব্যথা কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন শুধু শেষ শ্বাসটুকুর প্রতীক্ষা।

সংলাপ পাঠ শেষ করে আমরা আশ্রমিকরা নিস্তব্ধে একে অন্যের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত কাটালাম। উষার প্রথম লগ্নে গুরুদেবের কক্ষে গিয়ে দেখলাম তিনি অপূর্ব শান্তিতে শেষ নিদ্রায় মগ্ন। আমি তাঁর বক্ষে হাত রেখে বুঝলাম তাঁর প্রাণবায়ু বহুক্ষণ নিষ্ক্রান্ত। আমি নীলকান্তাকে বললাম, যাও গুরুমাতাকে বার্তা দাও।

কিয়ৎপর নীলকান্তা ছুট্টে এসে বলল, নাথ, গুরুমাতাও দেহরক্ষা করেছেন।

শ্মশানে মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করে নগ্ন, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় গুরু দেবানন্দ ও দেবী ভানুপ্রিয়াকে চিতার অগ্নিতে সমর্পণ করলাম আমরা। আর তারপরই সেই অলৌকিক ঘটনার স্ফুরণ দেখলাম। আগুনের লেলিহান শিখায় গুরু ও গুরুমাতার দেহ দুটি অপূর্ব রমণভঙ্গিতে উথালপাথাল হতে থাকল। আর

চিতা থেকে ধ্বনি জাগল বিচিত্র, ব্যাখ্যাতীত শীৎকারের। যেন এক অসম্ভব, লোকাতীত সংগমে লিপ্ত দেবানন্দ ও ভানুপ্রিয়া।

আমি জ্যেষ্ঠ শিষ্য হিসেবে মুখাগ্নি করেছিলাম গুরুদেবের গুরুমাতারও। জানি আজ থেকে আমি, জয়মঙ্গল স্বামী, গুরু দেবানন্দের কামশাস্ত্রাধ্যয়ন আশ্রমের অধ্যক্ষ। আমি নীলকান্তাকে আদেশ করলাম গুরুর কামকল্পনার তাবৎ পুঁথি চিতার পাশে এনে জড়ো করতে।

গুরুভাইরা সকলেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করল, এ কী করেন, প্রভু? কামকল্পনা দাহ করবেন? আমি পুঁথিপত্র একে একে আগুনে সঁপতে সঁপতে বললাম, দৈব কৃপায় অসম্ভব চাক্ষুষ হয়, যেমনটি আজ দেখলে। তার কি শাস্ত্র হয়? এই অসম্ভবের কাহিনিটুকুই লিখে রাখা যথেষ্ট।